সংবিধান সংশোধন ও নাগরিক ভাবনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩ আগস্ট ২০১০)

গত ২১ জুলাই জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ ধারার অধীনে সরকার সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশে সংসদের উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি 'সংসদীয় বিশেষ কমিটি' গঠন করেছে। সদস্যদের ১২ জনই আওয়ামী লীগ দলীয় এবং বাকীরাও মহাজোট সরকারে অন্তর্ভুক্ত। কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিএনপি'র কাছ থেকে একজনের নাম চাইলেও, বিএনপি তাতে সায় দেয় নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে, প্রধান বিরোধী দল মত পরিবর্তন করলে তাদের মনোনীত সদস্যকে পরবর্তীতে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জামায়াতে ইসলামীকে, যদিও সংসদে তাদের দু'জন সদস্য রয়েছে, কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এলডিপি'র কর্নেল (অব.) অলি আহমদকে। উদ্যোগটি সম্পর্কে আমরা নাগরিকরা কী ভাবছি?

১.০কমিটির গঠন, কার্যপরিধি ও সময়সীমা

প্রথমেই কমিটি নিয়ে আমাদের মনে অনেকগুলো প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই কমিটি গঠন করা হয়েছে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে। কিন্তু কেন সংবিধান সংশোধন? কী তার প্রয়োজন? কমিটির কর্মপরিধি কী? কমিটির কি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (basic structure) পরিবর্তনের এখতিয়ার রয়েছে? (অনেকের মতে, তা পরিবর্তনের এখতিয়ার কারোরই নেই।) কত সময়ই বা কমিটিকে দেওয়া হয়েছে?

আমরা যতটুকু জেনেছি, কমিটির জন্য কোনো 'টার্মস অব রেফারেন্স' বা কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। তাই আসলে কী উদ্দেশ্য নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে, তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। অবশ্যই পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত রায় বাস্তবায়ন কমিটির অন্যতম লক্ষ্য। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতা দখল রোধের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নও কমিটির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। একইসাথে কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধানের সবগুলো ধারা পর্যালোচনার, এমনকি সংবিধানকে যুগোপযোগী করার কথাও বলা হচ্ছে (*প্রথম আলো*, ৩০ জুলাই ২০১০)। ইতোমধ্যে কমিটি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, যদিও সাধারণ নাগরিকদের মতামত গ্রহণের ব্যাপারে তারা অনাগ্রহী (*কালের কণ্ঠ*, ৩০ জুলাই ২০১০)। সংবিধান সংশোধনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সংবিধান শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। এছাড়া কমিটির কার্যসম্পাদনের জন্য কোনো সময়সীমাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।

তাই নাগরিক হিসেবে আমরা চিন্তিত: কারণ কমিটিতে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব নেই। কমিটির কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। কমিটির জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর কমিটি নাগরিকের মতামত গ্রহণে অনাগ্রহী। দলীয় অনুগতদের বাইরে বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিটি পরামর্শ করবে কি-না, তা আমরা নিশ্চিত নই। আশা করি যে, আগামী সভা থেকে কমিটির কার্যপরিধি, সময়সীমা ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাব।

২.০ সংবিধানের কার্যকারিতা মূল্যায়ন

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বিষয় অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। একইসাথে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে ঘোষিত সামরিক শাসনকে বেআইনি ঘোষণা করেছেন। রায়ের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও তাদের তৎপরতা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধানগুলো (অনুচ্ছেদ ১২ ও ৩৮) পুনর্বহাল করে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আবারও আমরা পূর্বের চারটি মূলনীতিতে – জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় – ফিরে এলাম। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ চারটি মূলনীতি আমদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা – সম্মিলিত প্রত্যাশা, একতা, পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা, সমতা, ন্যায়পরায়ণতা, জনস্বার্থ, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদিরই প্রতিফলন।

ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপস্থিতিতেও, আমাদের সংবিধানে অন্য তিনটি মূলনীতি – 'জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র – অনেকটা বহাল ছিল এবং রয়েছে, যদিও পরিবর্তিতভাবে। যেমন, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে দিয়ে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছিল। একই সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারকে সমাজতন্ত্রের প্রতিফলন হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে। 'সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটি তার ১৯৭২ সালের রিপোর্টে বলেছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় প্রতিফলনের জন্য তারা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাই আজ প্রশ্ন তোলা জরুরি: এ তিনটি মূলনীতি বাস্তবায়নের, বিশেষত গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধান কতটুকু কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছে? তা না-করে থাকলে, এগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যও সংবিধান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন। অর্থাৎ পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত আদালতের রায় বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংবিধানের কার্যকারিতা মূল্যায়নও আজ আবশ্যক। আর এ মূল্যায়নও সংবিধান সংশোধনের ভিত্তি হওয়া দরকার। তাই আমরা মনে করি, বর্তমান কমিটির পাশাপাশি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বা কমিশন কাজ করা প্রয়োজন, যার দায়িত্ব হবে আমাদের বর্তমান সংবিধানের একটি চুলচেরা বিশ্লেষণ।

প্রসঙ্গত, প্রতিবেশী ভারতে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি এমএন ভেনকাটাচলিয়ার নেতৃত্বে ১১ সদস্য নিয়ে সংবিধানের কার্যকরিতা পর্যালোচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয় – এর আগেও পাঁচবার ভারতের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়েছিল। এটি একটি বুদ্ধিভিত্তিক গবেষণামূলক কাজ, তাই এ কমিশন একদল বিশেষজ্ঞকে নিয়ে করা হয়, কিন্তু তাঁদের কেউই ওই সময় সংসদ সদস্য ছিলেন না।

ভারতীয় পর্যালোচনা কমিশনের 'টার্মস অব রেফারেন্স' বা কার্যপরিধি ছিল: 'সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে একটি দক্ষ (efficient), নির্ঝঞ্ঝাট (smooth) ও কার্যকর (effective) শাসন ব্যবস্থা গড়ার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সংবিধান কতটুকু ভূমিকা পালন করে, গত ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে, তা পর্যালোচনা করা। একইসাথে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বা বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে, প্রয়োজন মনে করলে, এর বিধানে পরিবর্তনের সুপারিশ করা।' সংবিধান মূল্যায়ন একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়। তাই এই কমিশনকে এক বছর সময় দেয়া হয়, যদিও কাজটি সম্পন্ন করতে দু'বছর সময় লেগেছিল।

২.১ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংবিধানের কার্যকারিতা

আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দিকে তাকালে সংবিধানের এ ধরনের একটি গভীর মূল্যায়নের যৌক্তিকতা অতি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। গণতন্ত্রের কথায় আসা যাক। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র ...'। তাই গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ। আর গণতন্ত্র হলো জনগণের সম্মতির শাসন, যা নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তবে নির্বাচনই গণতন্ত্র নয়, এটি গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনামাত্র।

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের এ ক্ষমতার একটি অংশ, তাদের প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করে। আর প্রতিনিধিদের দায়িত্ব, সাংবিধানিক বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে, জনগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁদের প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের অধিকার হরণ করতে পারে, এমনকি তাদের স্বার্থবিরোধী কাজেও লিপ্ত হতে পারেন। তাই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতার সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক। আর তা করা হয় কতগুলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভাজন করে সাধারণত নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার – এই তিনটি বিভগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর পেছনে মোটা দাগের আকাঙ্ক্ষা হলো যে, আইনসভা সংবিধানে নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে থেকে, একটি আইনি কাঠামো তৈরি করবে, যা নির্বাহী বিভাগ বাস্তবায়ন করবে। আর নির্বাহী বিভাগ এগুলো সততা, দায়বদ্ধতা, কৃচ্ছ্রতার সাথে ও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করলো কি-না আইনসভা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে তা নিশ্চিত করবে। এটি হলো আইনসভার 'ওভারসাইট ফাংশন' বা নিরীক্ষামূলক দায়িত্ব। নির্বাহী ও আইনসভা যাতে তাদের সংবিধান নির্ধারিত ক্ষমতা ছাড়িয়ে না যায়, কুক্ষিগত না করে কিংবা অপব্যবহার না করতে পারে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার আলোকে ও পণ্ডিতদের চিন্তাপ্রসূত সৃষ্ট এ ক্ষমতার বিভাজন নীতির (Principles of separation of powers) মাধ্যমে উপরিউক্ত তিনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় এক ধরনের 'চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস' বা ভারসাম্য ও নজরদারিত্ব সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভাজন ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন এবং একইসাথে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সংবিধানে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো: নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, অ্যাটর্নি জেনারেল, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সৃষ্ট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলো স্থানীয় সরকার। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা প্রদর্শনে অপারগতার কারণে ১৯৯৬ সালে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়।

সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও কিছু বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে রয়েছে, যেগুলোর দায়িত্বও বহুলাংশে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এসকল প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন।

এছাড়াও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। তাই গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকারের স্বচ্ছতা-দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংগঠিত নাগরিক সমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপরিউক্ত সরকারি – সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ – প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতার ওপর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নির্ভর করে। তাই সংবিধানকে যুগোপযোগী করতে হলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হবে এবং এগুলো যাতে আরও শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল হয়, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। দুদকে'র মত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার যৌক্তিকতা নিয়েও ভাবতে হবে। একইসাথে ভাবতে হবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও বেগবান করার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করার কথা। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল আমাদের দেশে ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে ক্রমাগতভাবে কেন্দ্রীকরণ হয়েছে, যা দারিদ্র্য বৈষম্যের সমস্যাসহ আমাদের জন্য আরও অনেকগুলো জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নাজুক অবস্থার পেছনে একটি বড় কারণ হলো ক্ষমতার বিভাজনে, বিশেষত নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনে অস্পষ্টতা। এককেন্দ্রীক (unitary) সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিভাজন স্পষ্ট করা এমনিতেই দুরূহ – কারণ প্রধান নির্বাহী (প্রধানমন্ত্রী) এবং সংসদ নেতা একই ব্যক্তি – তবে আমাদের দেশে এ বিভাজন না মানার একটি অপসংস্কৃতি বর্তমানে বিরাজমান। আইনসভার সদস্য হয়েও আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদে আইন প্রণয়ন করে (উদাহরণস্বরূপ, উপজেলা আইন) নির্বাহী বিভাগের কাজে নিজেদের জড়িত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ওপর একটি নগ্ন হামলা। এছাড়া আমাদের প্রধানমন্ত্রী সময় সময় সংসদীয় কমিটির সভাপতিদের ডেকে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার নির্দেশ দেন, যা সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার কাঠামোর সাথে কতটুকু সংঙ্গিপূর্ণ তা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। তাই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার স্বার্থে নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার দায়িত্ব ও কার্যপরিধির বিধান আরও সুস্পষ্ট করতে হবে। একইসাথে সহাবস্থানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, আদিপত্য ও তাবেদারী নয়।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি সমস্যার দিকেও নজর দিতে হবে। আমাদের দেশে এখন সংসদীয় গণতন্ত্রের খোলসে একটি রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন পদ্ধতি বিরাজমান – এ পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীই সর্বেসর্বা। আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানের খসড়ায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার সুপারিশ থাকলেও

জাতির পিতার প্রতি প্রশ্নাতীত আস্থাশীলতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংবিধানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সত্যিকারের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এর পরিবর্তন আবশ্যক। কারণ, লর্ড এক্টনের সে কালজয়ী উক্তি অনেকেরই মনে আছে – ক্ষমতা দুর্নীতির জন্ম দেয়, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ দুর্নীতিরই জন্ম দেয়।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদও শাসন প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে সংসদে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে, এমনকি ভোটের সময় সংসদে অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্য পদ হারানোর ভয়ে সাংসদগণ তাঁদের বিবেক-বিবেচনা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না। এর মাধ্যমে তাঁদের বাক-স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকারও হরণ করা হয়। এছাড়া দল মনোনয়ন দিলেও, জনগণই প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ফলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির দল বা দলের নেতৃত্ব দ্বারা সংসদ সদস্য পদ হরণ জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণার প্রতিই চরম আঘাত। তাই সত্যিকার অর্থে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের স্বার্থে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ হয় বাদ দিতে, না হয় এর আমূল সংস্কার করতে হবে। এ ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের সাংবিধানিক বিধান পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে 'চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস' সিস্টেমকে পদদলিত করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আমাদের বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাহীনতা। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতেই দায়িত্ব পালন করতে হয় [অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩)]। তাই রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিজ বিবেক-বিবেচনা (mind) প্রয়োগের কোনো অবকাশ থাকে না, যা গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার কাঠামোকেই অকার্যকর করে তোলে। রাষ্ট্রপতিরও শুধু 'জানাজা পড়া' ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। এ অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি করা জরুরি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পাকিস্তানে এ দু'য়ের ক্ষমতার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্য আরও প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা, যাতে যোগ্য ও মেরুদণ্ডসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করার সুযোগ পান। এ লক্ষ্যে সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তে একটি 'ইলেকটোরাল কলেজ' বা নির্ধারিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিধান করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা হতে পারেন এ নির্বাচক মণ্ডলীরর সদস্য। প্রতিবেশী ভারতে এ প্রক্রিয়ায়ই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে অবশ্য প্রয়োজন হবে দল নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন।

সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় নীতি-নির্ধারণ ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হলো জাতীয় সংসদ। রাজনীতি সংসদকেন্দ্রীক না হলে, রাজপথে তা স্থান পায়, যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে সাধারণত আরও প্রকট, জটিল ও সহিংস করে তোলে। তাই জাতীয় সংসদকে প্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর করতে হবে। আমাদের সংসদ ক্রমাগতভাবে ব্যবসায়ীদের ক্লাবে পরিণত হয়েছে। ফলে সংসদ নির্বাচনে সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব নেই। সত্যিকারের জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো দরকার। তাই সংসদে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথাও আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে।

জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে হলে বর্তমান 'সংসদ বর্জনে'র অপসংস্কৃতির অবসান ঘটানো জরুরি। এ জন্য সংসদে অনুপস্থিত থাকার বিধি-বিধানকে আরও জোরদার করতে হবে। একইসাথে স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে সকলকে কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে। এ জন্যও সংবিধান সংশোধন আবশ্যক।

'চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস' পদ্ধতিকে কার্যকর করতে হলে প্রয়োজন প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের সত্যিকারের পৃথকীকরণ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত মামলার রায়ে বাহাত্তরের সংবিধানের মূল ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ অবিকল পুনরুজ্জীবিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই দু'টি অনুচ্ছেদ অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি-বদলি ও শৃঙ্খলার বিধানসম্পর্কিত।

এটি সুস্পষ্ট যে, কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে ভাল আইন ও পদ্ধতি, কার্যকর প্রতিষ্ঠান, ভাল ব্যক্তি এবং এ সকল ব্যক্তি থেকে ভাল আচরণ আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করলে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সদাচারণ করতে হবে। তবে সবগুলো প্রতিষ্ঠানে সৎ, যোগ্য ও নির্ভীক ব্যক্তিরা যাতে দায়িত্ব পান, সে জন্য তাঁদের নিয়োগের পদ্ধতি ও যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিধানকে আরও কঠোর করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতার মাপকাঠি ও তথ্য প্রদানের বিধানে আরও কঠোরতা আনতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যাতে আইনভঙ্গকারী ও দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরা আইনপ্রণেতা না হতে পারেন। আরও নিশ্চিত করতে হবে যে, সাংসদরা যেন তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রকাশ করে এবং ব্যক্তি ও কোটারি স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত না হন। এছাড়াও তাঁদের সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে টাকার খেলাও বন্ধ কতে হবে। আইনপ্রণেতা হয়ে তাঁরা যেন আইন বাস্তবায়নকারীতে পরিণত না হন, সেজন্য তাঁদের স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম থেকে দূরে রাখতে এবং সংসদীয় দায়িত্ব পালনে নিবিষ্ট করতে হবে। সংসদ সদস্যদের যোগ্যতার গুণগত মানে পরিবর্তন আসলে, সংসদের গুণগত মানেও পরিবর্তন আসবে এবং সংসদ কার্যকর হওয়ার পথও সুগম হবে।

অন্যান্য সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পদ্ধতি এবং মানদণ্ডও কঠোর করতে হবে। যেমন, উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে ভবিষ্যতে যেন কোনো 'প্রলয়' না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে। একই কাজ করতে হবে নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও। এ সকল পরিবর্তনের অনেকগুলোই আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

তবে যেখানে সাংবিধানিক বিধান প্রয়োজন, সে সব ক্ষেত্রে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। সাংবিধানিক বিধানের সাথে সাথে আইন প্রণয়ন করে এগুলোর কার্যকারিতাও প্রদান করতে হবে।

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো অতীতে সিন্ডিকেটের মতো আচরণ এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এ কারণেই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বারবার সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। তাই রাজনৈতিক দলের সংস্কার ব্যতীত আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাহুমুক্ত হবে না। তাই রাজনৈতিক দলকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এর জন্য যথার্থ বিধি-বিধানের কথা ভাবা দরকার। প্রসঙ্গত, জার্মানির সংবিধানে রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের সংশোধন করা আজ জরুরি।

২.২ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংবিধানের কার্যকারিতা

সমাজতন্ত্র তথা সামাজিক ন্যায় বিচারের কথায় আসা যাক। স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছর পরও, সরকারি হিসাব মতে, আমাদের প্রায় ৪০ শতাংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বসবাস করছে, যদিও দারিদ্র্য সীমারেখা নিয়ে অনেক গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। এদের অনেকেই চরম দরিদ্র বলে চিহ্নিত। অর্থাৎ দারিদ্র্য আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশের নিত্যদিনের সঙ্গী।

শুধু দারিদ্র্যই নয়, মুষ্টিমেয় ব্যতীত আমাদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী চরম বৈষম্যের শিকার এবং দিন দিন এ বৈষম্য প্রকটতর হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি তথ্য মতে, আমাদের দেশে ৫ শতাংশ ধনী পরিবারের জাতীয় আয়ের শেয়ার ১৯৯১-৯২ সালের ১৮.৮৫ শতাংশ থেকে ২০০৫ সালে ২৬.৯৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে দেশের ৫ শতাংশ সর্বাধিক দরিদ্র পরিবারের শেয়ার ১.০৩ শতাংশ থেকে ০.৭৭ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ ১৯৯১-৯২ সালে ধনী-দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য যেখানে ছিল ১৮ গুণ, ২০০৫ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৩৫ গুণে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের গণতান্ত্রিক শাসনামলে বাংলাদেশে আয়ের অসমতা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। এছাড়াও তৃণমূলের অধিকাংশ মানুষ এখন মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি থেকে চরমভাবে বঞ্চিত। বস্তুত একই ভূখণ্ডে এবং একই পতাকাতলে আমরা একটি চরম অসম ও বিভক্ত জাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছি।

আমাদের রাজনীতি আজ চরমভাবে দুর্বৃত্তায়িত। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও, লুটপাটতন্ত্র আজ আমাদের ওপর জেঁকে বসেছে। রাজনীতি আর দুর্নীতি এখন প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলতন্ত্র আর ফায়দাতন্ত্রের লাগামহীন চর্চার ফলে রাষ্ট্র বর্তমানে পরিচালিত হয় ক্ষমতাসীনদের প্রতি অনুগতদের স্বার্থে, জনগণের কল্যাণে নয়। তাই সামাজিক ন্যায়বিচার আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বরং হয়েছে তার উল্টো।

এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের সংবিধান কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে পারেনি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ভোটের অধিকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনি। তাই সাংবিধানিক বিধানসমূহে আজ এমন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নের পথ সুগম করবে। আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা তা না-করলে তাদের বাধ্য করার কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

৩. অন্যান্য সংশোধনীগুলোর বিবেচনা

সংবিধানকে যুগোপযোগী করতে হলে, পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ের আলোকে এটিকে সংশোধন করলেই হবে না; সংবিধানের অন্যান্য সংশোধনীগুলোও গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং এগুলো পরিবর্তন কিংবা বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা এমন একটি সিদ্ধান্ত। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত আদালতের রায়ের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ফিরিয়ে আনার ফলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে রাখার বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই একটি সংশোধনী এনে এ ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে।

সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান করা হয়। *বিশেষ অধিকার আইন, ১৯৭৪* (*Special Powers Act, 1974*) প্রণয়নের মাধ্যমেও নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। এ সকল আইন এবং এগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি সম্পর্কেও কমিটিকে ভাবতে হবে। একইসাথে মৌলিক অধিকারের পরিধি বৃদ্ধি করে শিক্ষার অধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলো মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো সংরক্ষিত মহিলা আসন (চতুর্দশ সংশোধনী) সম্পর্কিত। নারীরা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক হলেও মাত্র ৪৫টি আসন বর্তমানে নারীদের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়াও বিদ্যমান পদ্ধতি আলংকারিক এবং তা নারীদের ক্ষমতা কাঠামোর বাইরেই রাখে। এ ব্যবস্থায় নির্বাচিত নারী সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা অপ্রাসঙ্গিক এবং এ সকল আসন নেতা-নেত্রীদের করুণা হিসেবেই বিতরণ করা হয়। নারী সদস্যদের সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা না থাকার ফলে তাঁদের কোনো সুস্পষ্ট দায়-দায়িত্বও থাকে না। বহুদিন থেকেই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা বৃদ্ধির এবং এ সকল আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করে আসছে, যা তারা রক্ষা করেনি। আমাদের সুপারিশ হলো, জাতীয় সংসদে নারী আসন সংখ্যা ৪০ শতাংশে উন্নীত করা এবং ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে এগুলো জন্য সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলসমূহের প্রবল আন্দোলনের মুখে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের সংবিধানে তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক অবিশ্বাসেরই ফসল এবং এটি গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গেও অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই এটি বিলুপ্তির কোনো বিকল্প নেই। তবে এর জন্য প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং নির্বাচনী পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক সংস্কার, যা সময়সাপেক্ষ। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তত আরও

এক টার্ম থাকা যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা মনে করি – এ মুহূর্তে তা বাতিল করলে আগামী নির্বাচন অনিশ্চিত হতে পারে এবং আমরা আবারও সংকটের দিকে ধাবিত হতে পারি। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে এ ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন বলে আমাদের ধারণা।

৪.০ আদালতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রায়

নিঃসন্দেহে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের রায়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি বাস্তবায়িত হওয়া জরুরি। তবে উচ্চ আদালতের আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ রায় রয়েছে যেগুলো বাস্তবায়িত হওয়াও আবশ্যক। উপজেলা পদ্ধতি বাতিল হওয়ার পর ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রদত্ত এমন একটি রায় [কুদরত-ই- *ইলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* ৪৪ ডিএলআর(এডি)(১৯৯২)]। উক্ত মামলার রায়ে সরকারকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়: 'সংবিধানের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত ৯ অনুচ্ছেদের আলোকে নির্বাচনের মাধ্যমে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে ৫৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ শীঘ্রই নিতে হবে – তবে কোনো অবস্থায়ই যেন এ সময় এখন থেকে ছয় মাসের অধিক না হয়।' দুর্ভাগ্যবশত ১৮ বছর আগে প্রদত্ত এ রায়টি আজও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় নি।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রবল বিরোধিতার মুখেও উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, অথচ আজও জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আমাদের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশ বা স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন কায়েম করা বাধ্যতামূলক। আর গত চারটি নির্বাচিত সরকারই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আদালতের নির্দেশনাকে নগ্নভাবে অমান্য করেছে। তাই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পণ করা জরুরি।

এছাড়াও স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরে নির্বাচনের আয়োজন না করলে, সংশ্লিষ্ট আইনকে অমান্য করা হয় – যেমন, মেয়াদোর্ত্তীর্ণ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে গড়িমসি করে সরকার বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ আইন লঙ্ঘন করছে – কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা পরিষদ গঠন না করে স্বাধীনতা পররবর্তী প্রায় সবগুলো সরকারই সংবিধানকে পদদলিত করেছে। কারণ আমাদের সংবিধানই [অনুচ্ছেদ ১৫২(১)] জেলাকে প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

তাই শুধু সামরিক শাসকরাই নয়, আমাদের নির্বাচিত সরকারগুলোও সংবিধানকে পদদলিত এবং আদালতের নির্দেশকে ক্রমাগতভাবে অমান্য করেছে। তা না করলে বাংলাদেশের ইতিহাসই হয়ত ভিন্ন হতো। প্রসঙ্গত, *কুদরত-ই-ইলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায়টি বাস্তবায়নের সময়সীমা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতীতে সরকার আদালতের দ্বারস্থ হতো এবং অন্তত দু'ডজন বার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছিল বলেও আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি। কিন্তু এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য আর এখন শোনা যায় না।

এ প্রসঙ্গে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির প্রদত্ত হাইকোর্টের আরেকটি ঐতিহাসিক রায়ের উদাহরণ টানা যেতে পারে। বিগত জোট সরকারের আমলে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জেলা মন্ত্রীপদ সৃষ্টির ফলে সংসদ সদস্য হিসেবে নিজ এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়নের ভূমিকা রাখতে পারছেন না, এ অভিযোগে জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ২০০৩ সালে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। ২০০৬ সালে প্রদত্ত রায়ে বিচারপতিগণ বলেন: 'মন্ত্রী, হুইপ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা (যাঁদের কথাই উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে), তাঁদের কাউকেই উল্লিখিত কোনো জেলার জন্য নিয়োগ প্রদান করা যায় না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে পুরো দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দায়িত্ব ব্যতীত জেলাগুলোতে তাঁদের অন্য কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। একইভাবে সংসদ সদস্যদেরও জেলা বা অন্যান্য প্রশাসনিক একাংশের উন্নয়ন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা ও দায়িত্ব নেই। অতএব, মামলার বাদী, যিনি একজন সাংসদ, পিরোজপুর জেলা সম্পর্কে তাঁর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই' [আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ, ১৬বিএলটি(এইচসিডি)(২০০৮)]।

এ ধরনের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রায় রয়েছে – যেমন, রিমান্ড সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়, যেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যেও সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন। বস্তুত সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত আছে এমন সকল রায়ই বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক। এ ব্যাপারে রায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন নৈতিকতার পরিপন্থী হবে বলে আমাদের ধারণা।

৫.০ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুদিন থেকেই ধর্মের ব্যবহার – অপব্যবহার – হয়ে আসছে। *শুধাংশু শেখর হালদার বনাম নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য* (২০০১ সালের ইলেকশন পিটিশন নং ১০) মামলার রায় থেকে ধর্মের অপব্যবহার সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, জনাব সাঈদী ও তাঁর সহযোগীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা এই মর্মে অপপ্রচার চালান: কাফেরকে ভোট দেবেন না; কাফেরকে ভোট দিলে জানাজা হবে না, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে জান্নাতবাসী হবেন না; কাফেরকে ভোট দিলে গুনাহ হবে; আমাকে ভোট দিলে আল্লাহকে ভোট দেয়া হবে; আমাকে ভোট দিলে বেহেস্তে যেতে পারবেন; আমাকে ভোট দিলে আমি বেহেস্তের টিকেট দেব।

ট্রাইব্যুনালে বিজ্ঞ বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী ২০০৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মামলাটির রায় দেন। রায়ে আদালত জনাব সাঈদীর বিরুদ্ধে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে জনাব হালদারের চরিত্র হনন এবং তাঁকে ভোট দেওয়া থেকে ভোটারদেরকে বিরত করতে প্ররোচিত করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বলে সিদ্ধান্ত দেন। তবে আদালত স্বীকার করেন যে, পিরোজপুর-১ আসনের নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। জনাব সাঈদী নিজে এগুলোতে সরাসরি জড়িত না থাকলেও, নিঃসন্দেহে এ সকল অপপ্রচার জনগণের ধর্মানুভূতিকে উস্কে দিয়ে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে। 'দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমে' লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিলেও, আদালত জনাব সাঈদীকে নির্বাচনী ব্যয়ের অবৈধ হিসাব দাখিলের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর নির্বাচন বাতিল করে দেন।

রাজনীতিতে ধর্মের এধরনের অপব্যবহার কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং এর অবসান জরুরি। তবে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা না-করা একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্ন, রাজনৈতিক বিবেচনায়ই যার সুরাহা হতে পারে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করলে, এ সকল দলের অনুসারীরা, যারা সাধারণত পরকালের জন্য রাজনীতি করেন, উগ্রবাদের দিকে ধাবিত হবেন কি-না সে সিদ্ধান্ত রাজনীতিবিদদেরই নিতে হবে। এর পক্ষে-বিপক্ষেই সমর্থন আছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও ভারতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, যদিও এ স্পর্শকাতর কাজটি তিনি আদালত ও নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে করানোর চেষ্টা করছেন বলে অনেকের অভিযোগ।

পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর অবশ্য বাহাত্তরের সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদ ফিরে আসবে, যার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে সংবিধানে এ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপিত হওয়ার পর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অবৈধ হলেও, তা আপনা থেকে নিষিদ্ধ হবে না। সরকার চাইলে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বর্তমানে বিরাজমান ১২টি রাজনৈতিক দল, যারা নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত, নিষিদ্ধ করতে পারে। অথবা কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে, সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের অভিযোগে, দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার উদ্যোগ নিতে পারে। তবে সংবিধান লঙ্ঘন করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে কাউকে শাস্তি দিতে হলে অবশ্যই আইনপ্রণয়ন করতে হবে। দলগুলো অবশ্য তাদের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদের বিধানের সাথে নিজেদের নামের ও কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তবে সরকার চাইলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এখনই বন্ধ করতে পারে, এমনকি সংবিধান সংশোধন না করেই। এ জন্য আইনও আছে। *বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪*-এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মকে উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সংগঠন গড়ে তোলা বা এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা বেআইনী। সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই এ ধরনের সংগঠনকে বিলুপ্ত করতে পারে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিশেষত আইনমন্ত্রী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার কথা জোরালোভাবে বলছেন। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নয়, কোনো রাজনৈতিক দলকেই নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা কমিশনের নেই। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন ২০০৯*-এর রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সংক্রান্ত ৯০(গ) ও (খ) ধারা অনুযায়ী, কমিশনের শুধুমাত্র নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা আছে। এছাড়াও আইনের ৯০(জ)-এর (খ) ধারা অনুযায়ী, কোনো রাজনৈতিক দল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে, কমিশন তার নিবন্ধন বাতিল করতে পারে।

৬.০ আদালতের এখতিয়ার

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত আদালতের রায় নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন আদালতের এখতিয়ার নিয়ে। আগেই বলা হয়েছে, ক্ষমতার বিভাজন নীতির আলোকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোতে তিনটি অর্গান বা বিভাগই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও সমক্ষমতাসম্পন্ন (co-equal) এবং স্বাধীন (independent)। এগুলোর দায়িত্ব একে অপরের ওপর নজরদারিত্ব রাখা, যাতে কোনো বিভাগের বাড়াবাড়ির ফলে নাগরিকের অধিকার হরণ না হয়।

আমাদের লিখিত সংবিধান প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হলেও; সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীই সকল নির্বাহী ক্ষমতার মালিক। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'জাতীয় সংসদের ওপর আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।' বিচারবিভাগের দায়িত্ব বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা দেওয়া ও রক্ষা করা, যদিও বিচার বিভাগের ক্ষমতার পরিধি নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বিচারবিভাগ সংবিধানের অভিভাবক। বিচারবিভাগ যাতে তার কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে, সে লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথাও আমাদের সংবিধানে বলা আছে। এছাড়াও আমাদের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে, সংবিধানের অধীনে এবং কর্তৃত্বে যাকে যে ক্ষমতা, যতটুকু দেওয়া হয়েছে, সে সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করবে। তাই সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, আমাদের সরকার হওয়া উচিত সীমিত ক্ষমতার।

বিচার বিভাগ আইন প্রণয়ন করতে পারে না, যদিও আদালতের রায় আইনের সমতুল্য। আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের দায়িত্ব আইনসভার। আইনসভা প্রণীত আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে বিচার বিভাগ তা অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। তেমনিভাবে সংবিধানে পরিবর্তন ও সংশোধন সংবিধান অনুসরণে কিংবা সংবিধানের কোনো বিধান বা এর মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী হলেও, উচ্চ আদালত তা বাতিল করতে পারেন। কিন্তু কোনোভাবেই আদালত আইনসভার ভূমিকা খর্ব করে রায়ের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করতে পারেন না।

তবে নির্বাহী ও আইনসভার কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার (judicial review) এখতিয়ার আদালতের রয়েছে। এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের অবশ্যই বিচার বিবেচনা (margin of judgment) প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। বিশেষত সাংবিধানিক ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে এ সুযোগ অনেক বেশি। কারণ সংবিধানকে 'অর্গানিক' ও 'লিভিং ডকুমেন্ট' বা জীবন্ত দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সময়ের ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যাখ্যাও পরিবর্তিত হয়। যেমন, আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ নিশ্চয়ই পরবর্তী সামরিক অভ্যুত্থানের কথা ভাবেন নি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে লুটপাটতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করেননি। তাই অনেকের মতে, আদালত যা বলেন, তা-ই সংবিধান। ফলে সাধারণ আইনের মাধ্যমে বিচারিক পর্যালোচনার আদালতের এখতিয়ার খর্ব করা যায় না। এমনকি সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে তা করা হলেও, সে বিধান বেআইনিভাবে কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গৃহীত হয়েছে কি-না তা পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করার এখতিয়ারও আদালতের রয়েছে [*আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ*, ১৯৮৯ বিএলডি (সাপ্লিমেন্ট)]। অনেকের মতে, আমাদের সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্টকে অগাধ ক্ষমতা দিয়েছে।

তবুও বিচারিক পর্যালোচনার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতকে সংযত হওয়ার এবং সাবধানতা প্রদর্শনের কথা অনেকেই বলেন। লর্ড ডিপ্লকে'র মতে, আইনের লঙ্ঘন (illegality), অযৌক্তিকতা (irrationality) ও পদ্ধতিগত ত্রুটির (procedural error) ক্ষেত্রেই বিচারিক পর্যালোচনা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত [সিসিএসইউ বনাম মিনিস্ট্রি অব সিভিল সার্ভিস (১৯৮৫) এসি ৩৭৪], যদিও এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কারণ আইনসভা এবং বহুলাংশে নির্বাহী বিভাগ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং তাদের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। তাই অনেকের মতে, আদালতের সকল নির্দেশনা মানা আইনসভার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এ প্রসঙ্গে সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক, যে অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সুপ্রিম কোর্টের সহায়তায় আসা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে বৃটেনের পার্লামেন্টের মত আমাদের সংসদ সার্বভৌম নয় – সংবিধানই সার্বভৌম – এবং আমাদের সংসদ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না [*বিশেষ রেফারেন্স অনুচ্ছেদ ১৪৩*, এআইআর (১৯৬৫) এসসি৭৪৫]।

প্রসঙ্গত, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত মামলার রায় আইনসভার জন্য মানা বাধ্যতামূলক কি-না তা নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। কিছু অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও আইনজীবি বলছেন যে, রায় ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই তা সংবিধানের অংশ হয়ে গিয়েছে এবং তা মানা সকলের জন্যই বাধ্যতামূলক – এরজন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। যেমন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর মতে, আপিল বিভাগের রায়ের পর সংসদে বিল এনে সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই (*কালের কণ্ঠ*, ৩০ জুলাই, ২০১০)।

অন্যদিকে সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদের দোহাই দিয়ে অনেকেই দাবি করছেন যে, আপিল বিভাগের সাম্প্রতিক রায়কে কার্যকারিতা প্রদানের জন্য অবশ্যই সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে হবে। কারণ সংবিধান সংশোধনের এখতিয়ার, ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুসরণে, শুধুমাত্র সংসদের, বিচার বিভাগের নয়। তবে সংসদে পাশ করা সংবিধান সংশোধনী আদালত অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। বারবার তা করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আদালত নিজে সংবিধান সংশোধন করতে পারেন না।

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল মামলার রায়ে আদালত ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনামলের অনেকগুলো কার্যক্রমকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেও, কিছু কার্যক্রমকে জনস্বার্থে বৈধতা দিয়েছেন। অনেকের মতে, এ ধরনের 'পিক এন্ড চুজে'র মাধ্যমে আদালত আইনসভার ওপর ন্যস্ত আইন প্রণয়নের ভূমিকা পালন করেছেন। আদালতের এ ধরনের ভূমিকাকে 'জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম' (judicial activism) বা আদালতের অতি তৎপরতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। আদালতের অতি তৎপরতা পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গিয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। এছাড়াও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত থাকলেও পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি (লিভ টু এ্যাপিল) না দেওয়ারও সমালোচনা করেছেন।

এ ব্যাপারে একটি বিরুদ্ধমতও আছে। অনেকের মতে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর চতুর্থ সংশোধনী পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা কোনোভাবেই জনস্বার্থের অনুকূলে নয়। এছাড়াও চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক চেতনা তথা সংবিধানের মূল কাঠামোর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সেগুলোই আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছেন। অন্যগুলোর, যেগুলো সংবিধানের মূল কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, আদালত বৈধতা না দিলেও মার্জনা (condone) করেছেন, যদিও কার্যকারিতার দিক থেকে দু'টোই সমান। অনেকের মতে, আদালত বর্তমান সরকারের সহায়তায় একটি বিজ্ঞোচিত কাজ করেছেন। পঞ্চম সংশোধনী পুরোপুরি বাতিল হলে, সরকারকে সংবিধান সংশোধনী বিল এনে চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করতে হতো, যা কোনোভাবেই স্বস্তিকর হতো না।

৭.০ আধুনিকীকিকরণের লক্ষ্যে সংযোজন

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত রায় বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধন আবশ্যক। এতে ত্রুটি, অসামঞ্জস্যতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের জন্যও তা করা দরকার। রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণেও সংবিধান সংশোধন জরুরি। একইসাথে সংবিধানকে উন্নতর ও যুগোপযোগী করাও প্রয়োজন।

সংবিধানকে যুগোপযোগী করার জন্য সংসদের উচ্চ কক্ষ স্থাপনের কথা গভীরভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আরও বিবেচনা করা যেতে পারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে এক ধরনের মিশ্র ব্যবস্থা। সংসদের মেয়াদকাল কমানোর এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, বিশেষত একজন ব্যক্তি কতবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন তা সীমাবদ্ধ (term limit) করার কথাও ভাবা যেতে পারে। আরও ভাবা যেতে পারে সংবিধানে প্রতিনিধিদের 'রিকল' বা প্রত্যাহারের বিধান অন্তর্ভুক্ত করার কথা। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংবিধান লঙ্ঘন রোধ করার জন্য শাস্তির বিধানও সংবিধানে সংযোজন করা যেতে পারে। সংবিধানকে উন্নতর ও আধুনিক করার জন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে একটি সংবিধান পর্যালোচনা কমিশন গঠন।

৮.০ অবৈধ ক্ষমতা দখল রোধ

এটি সুস্পষ্ট যে, সংবিধান সংশোধনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য অবৈধ ক্ষমতা দখল রোধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, 'বুলেট নয়, ক্ষমতা পরিবর্তন হবে ব্যালটে'। অনেকে সেজন্য কঠোর শাস্তির, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের বিধানের প্রস্তাবও করছেন। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত রায়ে মহামান্য আদালতও অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন।

অবশ্যই সামরিক বাহিনী কিংবা তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় অবৈধ ক্ষমতা দখল ভবিষ্যতে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু সংবিধানে কঠোর বিধান, এমনকি শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করে কি তা বন্ধ করা যাবে? এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উদাহরণ টানা যেতে পারে। জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: '৬.(১) কোনো ব্যক্তি যে সংবিধানকে ক্ষমতাবলে বাতিল

করে, পরিবর্তন করে, অথবা জোর করে বা শক্তি প্রদর্শন করে বা অন্য কোনো অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা বা ষড়যন্ত্র করে, সে ব্যক্তি চরম দেশদ্রোহীতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে। (২) কোনো ব্যক্তি (১) ধারায় উল্লিখিত কার্যক্রমের সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান করলে, সে ব্যক্তিও একইভাবে চরম দেশদ্রোহীতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে। (৩) সংসদ আইনের মাধ্যমে চরম দেশদ্রোহীতার শাস্তি নির্ধারণ করবে।'

দেশদ্রোহীতার শাস্তি সাধারণত মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু এ সংবিধান রচনার পর অবৈধভাবে ক্ষমতাদখলকারী পাকিস্তানী জেনারেল জিয়াউল হকের মৃত্যুদণ্ড হয় নি। বরং মৃত্যুদণ্ড হয়েছে সংবিধান প্রণয়নকারী জনাব ভুট্টোর। নিয়তির কি পরিহাস! তাই কঠোর শাস্তির বিধান করে অবৈধ ক্ষমতা দখল এড়ানো যায় না। এছাড়াও জেনারেল পারভেজ মোশার্‌রফ এখনও বহাল তবিয়তেই আছেন। অবৈধ ক্ষমতাদখলকারীরা সংবিধান পড়েও ক্ষমতা দখল করেন না। উপরন্তু বিচারকদের সংবিধান ব্যাখ্যা প্রদানের অনেক চোরাগলি আছে – সময়ের প্রয়োজনীয়তা (doctrine of necessity), রাজনৈতিক প্রশ্ন (political question), সফল বিপ্লব (successful revolution), মার্জনা প্রদান (doctrine of condonation) ইত্যাদি – যা ব্যবহার করে বিচারপতিরা অতীতে অবৈধ ক্ষমতা দখলের বৈধতা দিয়েছেন। পাকিস্তানে যা বার বার ঘটেছে।

আমাদের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, অধিকাংশ অবৈধ ক্ষমতা দখলের জন্য দখলকারীরা যতটুকু দায়ী, রাজনীতিবিদরা তার চাইতে কম দায়ী নন। রাজনীতিবিদরাই অনেকক্ষেত্রে দখলকারীদের উৎসাহিত করেছেন এবং প্রশ্রয় দিয়েছেন। রাজনীতিবিদদের মদদ ও সহায়তা ছাড়া অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা ক্ষমতা জোর করে কেড়ে নিতে পারে না, কেড়ে নিলেও টিকে থাকতে পারে না। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না, যার প্রমাণ জেনারেল এরশাদ, যিনি বর্তমান জোট সরকারেই শরীক এবং যাকে নিয়ে অতীতে আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলই কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে অনেক টানাটানি করেছে (*প্রথম আলো*, ১৫ জানুয়ারি ২০০৭)।

আর রাজনীতিবিদরাই তাদের সীমাহীন দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন, স্বার্থপরতা, সংবিধান ও আইনের লঙ্ঘন, দুঃশাসন এবং সাধারণ জনগণের অধিকার হরণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেন, তারই বিষফল অবৈধ ক্ষমতা দখল। এছাড়াও রাজনীতিবিদদের যথেচ্চারিতার কারণে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর চরম দুরবস্থাও অবৈধ ক্ষমতা দখলকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে পড়ার কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও ভেঙ্গে পড়েছে, যা অবৈধ ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করেছে। রাজনীতিকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, হানাহানি ও মৌলিক বিষয়ে সমঝোতার অভাবও অগণতান্ত্রিক পন্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক হয়েছে। উপরন্তু অস্ত্রের মুখে অবৈধ ক্ষমতা দখল রাজপথকেন্দ্রিক, অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এ কারণেই বন্ধু সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর সাম্প্রতিক কলামের শিরোনাম দিয়েছেন, 'শুধু সংবিধান সংশোধন নয়, প্রয়োজন রাজনীতিকদের সংশোধন' (*প্রথম আলো*, ২৩ জুলাই, ২০১০)। ড. আকবর আলী খানও সম্প্রতি ভবিষ্যতের বিপর্যয় এড়ানোর জন্য রাজনীতিবিদদের শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন (প্রথম আলো ৩০ জুলাই, ২০১০)।

৯.০ উপসংহার

পরিশেষে, সংবিধান একটি রাষ্ট্রের ধ্রুবতারা ও ভবিষ্যতের রূপরেখা। তাই আমাদের জন্য একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী একটি সংবিধান প্রয়োজন, যে সংবিধানে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হবে এবং যাতে তাদের মালিকানা থাকবে। যে সংবিধান হবে আধুনিক। যে সংবিধান আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহকে কার্যকারিতা প্রদান করতে পারবে এবং একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য সহায়ক হবে।

সংসদীয় বিশেষ কমিটির ওপর সংবিধানের সংশোধনী আনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি ও সময়সীমা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আমরা জানি না, কমিটি পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায় বাস্তবায়ন ও অবৈধ ক্ষমতা দখল রোধ করার বিধান তৈরীর বাইরে যাবে কি-না। কমিটি যদি সংবিধানকে যুগোপযোগী করার কাজে হাত দিতে চায়, তাহলে কমিটিকে সহায়তার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠনের প্রয়োজন হবে।

সংবিধান সংশোধন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি পবিত্র দায়িত্বও বটে। একইসাথে এটি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে হালকাভাবে নেওয়ার কোন অবকাশ নেই। তাই আমরা আশাকরি যে, কমিটি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে এবং কোনোরূপ ছলচাতুরির আশ্রয় নেবে না। কারো গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করবে না। নিজের বিবেক ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে তারা অগ্রসর হবে।

আমরা আরও আশাকরি যে, কমিটি তার কাজ শুরু করবে সংবিধানের শিরোনাম পরিবর্তনের মাধ্যমে। আমাদের বর্তমান সংবিধান হলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী' বাংলাদেশের সংবিধান। কিন্তু একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে 'প্রজা' থাকে না – স্বাধীন দেশের জনগণ হলো 'নাগরিক'। নাগরিকের অধিকার থাকে, কিন্তু প্রজার তা থাকে না। প্রজা হলো রাজা বা প্রভুর করুণার পাত্র। তাই আমাদের সংবিধানের শিরোনাম থেকে প্রজাতন্ত্র কথাটি বাদ দেওয়া অতীব জরুরি।